দৈনিক জনকণ্ঠ

19

তারিখ ... FEB 06 2004 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য প্রফেসর ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এদেশের শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষাবিদ। তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন যথাক্রমে ঢাকা (এমএসসি), দিল্লী (পিএইচডি) এবং যুক্তরাজ্যের সাসেক্স, বিশ্ববিদ্যালয়ে (পোস্ট-ডক্টরাল)। গবেষণা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ভ্রমণ করেছেন বিশ্বের প্রায় সকল দেশ। ছাত্র জীবনের বাম নেতা প্রফেসর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের নির্বাচিত ডিন (দুই বার), ছাড়াও দীর্ঘদিন সিনেট, সিন্ডিকেট সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্যানেলে তিনি নির্বাচিত হয়েছিরেন এবং বাংলাদেশ সমাজ বিজ্ঞান সমিতির সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন। তিন যুগেরও অধিককাল শিক্ষকতার পেশা জীবনে তিনি ১০ জন পিএইচডি এবং ৫ জন এমফিল গবেষকের গবেষণা তত্ত্বাবধায়ন, ১০টি গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে ত্রিশের অধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং সোসাল সায়েন্স রিভিউ, জার্নাল সম্পাদনা করেছেন। ২০০০ সালের একুশের বইমেলায় প্রকাশিত তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো') অনন্যা প্রকাশনী, প্রচ্ছদ ঃ ধ্রুব এষ, আলোকচিত্র ঃ নাসির আলী মামুন, পৃষ্ঠা ঃ ১৬০) সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ মুক্তিযুদ্ধের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী প্রথম গ্রন্থ। বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় নৃবিজ্ঞানী সমাজতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে উচ্চ-শিক্ষা-গবেষণা শিক্ষা আন্দোলনে নিবেদিত থেকে স্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন। পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটে নবসূচিত একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় উচ্চশিক্ষা চেতনা সম্পর্কে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন ঃ

একবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষা চেতনা

প্রফেসর ডঃ আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী
সাবেক সদস্য, ইউজিসি, ডিন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা ভার্সিটি

■ একবিংশ শতাব্দী হলো অশিক্ষা নির্মূলের শতাব্দী। বিশ্বের কেন্দ্রে ও প্রান্তে কোন দেশ ও অঞ্চলই থাকবে না, যেখানে একজন নিরক্ষর/অশিক্ষিত লোক পাওয়া যাবে। ধরিত্রীর বুকে সবাই শিক্ষিত হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ঃ অনাগতকালের সীমাহীন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে মানব জাতিকে সুস্থ-সুন্দরভাবে টিকে থাকার প্রয়োজনে সবাইকে অতি অবশ্যই শিক্ষিত করতে হবে।

■ অবশ্য নাগরিকদের সকলকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা একবিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার আগেই গত শতাব্দীতে সম্পন্ন করেছে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ। ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলো এক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে অনেক আগেই। দক্ষিণ এশিয়া ও এশিয়ার দেশগুলোও বসে নেই।

■ শিক্ষা বিস্তারের গতি অবশ্য সকল দেশে সমান নয়। দেশ ভেদে পরিস্থিতির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন গত শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় শত ভাগ মানুষ শিক্ষিত হয়েছে; কিন্তু চীনে হয়নি। যতটুকু হয়নি ততটুকুও সম্পন্ন করে ফেলা হচ্ছে। কোরিয়াতে আমি দেখেছি ৭০, ৮০ বছর বয়সীরাও স্কুলে যাচ্ছে। সেইসব বয়স্ক লোকদের মধ্যে প্রশ্ন ও দ্বিধা ছিল। তাঁরা বলতেন, দু'দিন পর আমরা মারা যাব, আমরা শিক্ষিত হয়ে কি করব? কোরিয়ান নেতা কিম ইল সুং উত্তর দিয়েছেন ঃ তোমরা অশিক্ষিত হয়ে জন্ম নিয়েছ, শিক্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ কর। অশিক্ষিত অবস্থায় তোমাদের আমরা মরতে দিতে পারি না। শিক্ষার চেতনা কত প্রবল ও প্রাণময় হতে পারে, এ উদাহরণ থেকেই সেটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

■ উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে শিক্ষা চেতনা কতটা আছে, তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই; শিক্ষা বৃদ্ধির দুর্বল পরিসংখ্যান দেখলেই তা পরিষ্কার হয়। এদেশে বহুদিন দেশপ্রেমিক সরকার ছিল না, গণমুখী শিক্ষানীতিও ছিল না। ফলে শিক্ষা প্রক্রিয়া সকল মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি। তবে, বেগম জিয়ার আমলে বয়স্ক ও নারী শিক্ষাকে বৃদ্ধি করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশের শিক্ষাচিত্রকে উজ্জ্বল করেছিল। দেশে শিক্ষিতের হার বেড়েছিল অনেকাংশে।

■ দেশপ্রেমিক-গণতান্ত্রিক সরকার এবং গণমুখী শিক্ষানীতি না থাকায় কেবলমাত্র শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিই ব্যাহত হয়নি; উচ্চশিক্ষা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উচ্চশিক্ষার মান আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে গেছে। এমনকি, বিশ্বব্যাংক পর্যন্ত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্রমাবনতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

■ রাষ্ট্রীয় নীতিগত সমস্যার ফলে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষার্থী গড়ে ওঠেনি। শিক্ষার্থীদের ইংরেজী জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। ফলে অরিজিন্যাল সূত্র ইংরেজী থেকে পড়াশোনা করতে বা বুঝতে পারছে না অনেকেই। শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস দারুণভাবে কমে গেছে। সোজা রাস্তায় একটি সাধারণ ডিগ্রী নেয়ার জন্যই উদগ্রীব থাকছে শিক্ষার্থীরা। জ্ঞানের বিকাশ জগতে প্রবেশ করতে পারছে না বা করতে চাচ্ছে না। তবে এক্ষেত্রে আশার কথা এই যে, বেশকিছু তরুণ-তরুণীর মধ্যে তীব্র জ্ঞানস্পৃহাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক এবং বেশকিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমি উজ্জ্বল সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছি। একাডেমিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া গেলে ভবিষ্যতে তারা খুবই ভাল করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। বাংলাদেশের শিক্ষা চেতনাকে প্রজ্বলিত করে সর্বব্যাপ্ত করার জন্য এই তরুণ প্রজন্মকে সামনে এগিয়ে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। এতে যেমনভাবে শিক্ষা চেতনা বাড়বে, তেমনিভাবে জ্ঞান ও শিক্ষার ঐতিহ্যও ধারাবাহিকভাবে এগুতে পারবে।

■ এক্ষেত্রে একটি কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উচ্চশিক্ষা চেতনার প্রধান ও প্রথম কথাই হলো নিরন্তর জ্ঞান অন্বেষণ এবং গবেষণা। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো সেই শিক্ষা ও গবেষণাকে বাধাহীনভাবে চর্চার প্রতিষ্ঠান। সন্ত্রাস, সেশন জট ও অন্যান্য কারণে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ বর্তমানে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সুষ্ঠু পরিবেশ না পেলে সুষ্ঠু ফলাফল কখনই আশা করা যায় না। মাসের পর মাস বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিপন্ন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাছ থেকে মৌলিক গবেষণা ও শিক্ষা প্রচেষ্টা পাওয়া সম্ভব নয়। এ সকল সমস্যা যারা সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে; আমাদের শিক্ষাকে পরিচালনার জন্য সরকার, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বকেও পর্যালোচনা করতে হবে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তখনই সফল হতে পারবে, যখন সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে এবং নিজে নিজ সীমাবদ্ধতার জন্য সৎ সাহসের সাথে দায়িত্ব স্বীকার করতে পারবে। সৎ সাহস না থাকলে উচ্চশিক্ষার চেতনাকে সর্বব্যাপ্ত করা এবং শীর্ষ থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া যাবে না।

■ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা মানে চ্যালেঞ্জ জয় করবার শক্তি ও সামর্থ্যে পূর্ণ শিক্ষা। শিক্ষার জন্য বা সার্টিফিকেটের জন্য শিক্ষা নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে ঃ ক) মানুষের মঙ্গল; খ) নিজের আত্মীক ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধন; এবং গ) নতুন সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উজ্জ্বল ভবিষ্যত বিনির্মাণ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গজদণ্ড মিনারে বসে তত্ত্ব হাজির করলেই শুধু চলবে না। নীতির উৎকর্ষতার বাহবা নিলে চলবে না; বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে হবে। ক) মানুষের মঙ্গলার্থে প্রয়োগ করতে হবে ঃ স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিকাঠামো, জাতি গঠন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে। খ) বেকারত্ব ও হতাশামুক্ত জীবনের জন্য সমৃদ্ধ তারুণ্য গড়ে তোলার মাধ্যমে। এবং গ) একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতাকে আয়ত্ত করে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে। কোরিয়ান নেতারা যেভাবে একজন মানুষকেও অশিক্ষিত ও মানবেতর অবস্থায় মরতে দিতে চায়নি; এবং চায়নি বলেই এগিয়ে গেছে সমৃদ্ধির পথে। বাংলাদেশেও আমাদের এমন একটি প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষা চেতনা হলো সুন্দর ভবিষ্যত ও নিরাপদে বেঁচে থাকার প্রত্যাশা।